ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

মো. শাহ্‌নূর রহমান
নাজমুল হুদা মিনা
গোলাম মহিউদ্দীন

৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*
প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা দল

মো. শাহ্নূর রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
গোলাম মহিউদ্দীন, *সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ*

গবেষণা সহকারী

বি.এম. শাকিল ফয়সাল

মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, আব্দুল্লাহ আল আরমান, মোহাম্মদ হোসাইন, মো: সালমান ফারুক

প্রতিবেদন প্রকাশ: ৫ ডিসেম্বর ২০১৯

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বর্ধিত সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ একটি পুরানো সংকট। ১৯৭৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের ফলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকার প্রথম 'অপরেশান নাগমিন' (ড্রাগন কিং) পরিচালনার মাধ্যমে রাখাইন এবং কাচিন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দমন পীড়ন ও গণহত্যা শুরু করে। এর ফলে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেয়ার জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর ১৯৭৯ সালে এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বাকি ২০ হাজার জনের মধ্যে ১০ হাজার জন বিভিন্ন সময়ে মারা যায় এবং ১০ হাজার জন নিখোঁজ ছিল।

১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকারের নাগরিক আইনে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় টানাপোড়েন শুরু হয়। ১৯৯১ সালে গণহত্যা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কাঠামোগত কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নেয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি) গঠন করে। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের (ইউএনএইচসিআর) মধ্যস্থতায় দুই লাখ ৩০ হাজার শরণার্থীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়।

এরপর আবার ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ২০১৬ সালে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নতুন করে পালিয়ে আসে আরও ৯০ হাজার, এবং ২০১৭ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৭৪ হাজার জন আশ্রয়প্রার্থী। সর্বশেষ ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৮৪১ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে যা স্মরণকালের ভয়াবহতম অনুপ্রবেশ এবং পৃথিবীর দ্রুততম শরণার্থী বিপর্যয়।[১] জাতিসংঘ কর্তৃক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে 'নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত, এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের এই নৃশংসতাকে 'জাতিগত নিধন' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] এছাড়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা একে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৩]

রোহিঙ্গা সংকটের ফলে শুধু বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না, বরং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অনেক দেশের সরকার ও মানুষের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পূর্বে বাংলাদেশ ইউএনএইচসিআর-এর শীর্ষ শরণার্থী আশ্রয় প্রদানকারী দেশের তালিকায় ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম শরণার্থী আশ্রয়প্রদানকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত।[৪] রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয়ভাবেও এ বিশাল অনুপ্রবেশকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাগত জানানো হয়, যদিও এর বহুমুখি প্রভাব ও বিভিন্ন প্রকার উদ্বেগ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহৎ হওয়ায় এবং স্বল্প সময়ে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়ার ফলে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা ও এর গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি ২০১৭ সালে একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় এ সমস্যার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুশাসন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রোহিঙ্গাদের আগমন ও আশ্রয় স্থাপনে দুর্নীতির শিকার; ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে অসমতা; ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎসহ নানা

[১] ISCG, Situation report, July 2019.
[২] দি কনভারসেশন, 'The history of the persecution of Myanmar's Rohingya', সেপ্টেম্বর ২০১৭; https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040
[৩] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/
[৪] COAST and CCNF, *Crisis within the Crisis*, July 2018.

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে।[৫] সম্প্রতি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বড় অংশ এখনো একই মাত্রায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বর্ধিত পরিসরে বিদ্যমান। এছাড়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার বিষয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। এ প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

১. রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা;
২. রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
৩. সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যবেক্ষণে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়, ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ, ক্যাম্প-ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়, বন বিভাগ, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য হিসেবে রোহিঙ্গা সংকট ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রয় ক্যাম্পের প্রকারভেদে সব ধরনের ক্যাম্প (নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত) পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

এই গবেষণায় রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, সাড়া প্রদান, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যাবর্তন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবেশগত প্রভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি ১৩ জুলাই - ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

২.১ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি অংশীজন

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয় খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এফডি-৭ এর আওতায় এনজিওগুলোর কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান করছে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ে (কক্সবাজারে) ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে আরআরআরসি এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়। এছাড়া যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে।

[৫] টিআইবি, 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা', ২০১৭।

বেসরকারি অংশীজন

হিউম্যানিটারিয়ান অংশীজনদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কৌশলগত নির্বাহী দল (এসইজি) নেতৃত্ব প্রদান করছে; এর সহপ্রধান হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) চীফ অব মিশন, জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কাজে বিভিন্ন সেক্টর বা খাতভিত্তিক (খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) সমন্বয়ের জন্য রয়েছে ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)। উল্লেখ্য সাতটি খাতের সবগুলোতেই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বে রয়েছে।

২.২ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উদ্যোগ

২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় রোহিঙ্গা সংকটের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিসহ সুশাসন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করার পাশপাশি এর থকে উত্তরণে যেসব সুপারিশ করা হয়, তার মধ্যে নিচের উদ্যোগগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

- অনাথ শিশুদের (৩৬,৩৭৩ জন) তালিকা সম্পন্ন করা;
- অভিযোগ নিরসণে "কমপ্লেইন ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট" ব্যবস্থা চালু করা;
- পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিরূপণে সমীক্ষা পরিচালনা ও ক্ষতিরোধে সুপারিশ প্রণয়ন;
- অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে পূর্বে প্রচলিত ত্রাণের টোকেনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের কার্ড, যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড, অ্যাসিস্ট্যান্স কার্ড, ফ্যামিলি কাউন্ট কার্ড, আরসিএন কার্ড, ফুয়েল কার্ড ও ফুড কার্ড চালু করা;
- আইএসসিজি ও আরআরআরসি'র কার্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট বিরতিতে যথাক্রমে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' এবং 'মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা' প্রকাশ; এবং
- মানবিক সহায়তায় বিভিন্ন খাতের বছরভিত্তিক (২০১৭-১৯) আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করা।

এছাড়া অন্যান্য গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পগুলো পরিচালিত করা; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় ২৮টি সিআইসি অফিস নির্মাণ ও সিআইসি নিয়োগ; রোহিঙ্গাদের জন্য ভাসানচরে আবাসন নির্মাণ: ১২০টি গুচ্ছগ্রাম ১,৪৪০টি ব্যারাক ও ১২০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যৌথ ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা; আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহস্থালী বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রকল্প গ্রহণ; ১,২৭,৮৫২টি পরিবারকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহ; ই-ভাউচার পদ্ধতিতে প্রতি রোহিঙ্গার জন্য মাসিক ৭৭০-৭৮০ টাকা মূল্যের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা চালু; এবং ক্যাম্পের ভেতরে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে দুইটি ক্যাম্পের দুইটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্যাম্প প্রতিনিধি বাছাই উল্লেখযোগ্য।

২.৩ রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সমন্বয়ের ঘাটতি

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। সরকারি অংশীজনের মধ্যে এনজিও কার্যক্রমের তদারকিতে বিশেষত কার্যক্রমের অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান এবং ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে জেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আরআরআরসি কার্যালয় একই ভূমিকা পালন করে। এর ফলে এনজিওগুলোর প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি এবং নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ডিসি অফিস ও আরআরআরসি'র মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণায় অস্পষ্টতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং আরআরআরসি'র মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল, এবং এক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প পর্যায়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাজের পুনরাবৃত্তি ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকা সত্ত্বেও একটি ক্যাম্পে দুই'টি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লার্নিং সেন্টার তৈরিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে উক্ত ক্যাম্পে ডোবা, নালা ও পাহাড়ের ওপর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে লার্নিং সেন্টার স্থাপন হয়েছে। অথচ যেসব ক্যাম্পের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয় সেখানে লার্নিং সেন্টারের অপ্রতুলতা রয়েছে।

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি

জনবলের ঘাটতি

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান। ১২ জন সিআইসি ও ২২ জন অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসিসহ মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা দ্বারা প্রায় দশ লক্ষ জনগোষ্ঠীর বসবাসরত ৩৪টি ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। জনবল ঘাটতির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন

সিআইসিকে ৩-৫টি ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সার্বিকভাবে জনবল ঘাটতির কারণে ক্যাম্পের তদারকি ব্যাহত হয় এবং ক্যাম্প পরিচালনা ও ত্রাণ বণ্টনে 'মাঝি'দের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়, ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ক্যাম্প পরিচালনায় সিআইসিদের দক্ষতা ও মানবিক নীতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ঘাটতি

শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সমন্বয় রেখে 'মানবিক নীতি' মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিকন্তু, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থায় পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ সমন্বয় করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষত 'মানবিক সহায়তার নীতি' বিষয়ে সিআইসিদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে সিআইসি ও তার সহযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক নীতি না মেনে চলার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সাথে খারাপ আচরণ এবং শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য মাত্র নয়জন সিআইসিকে 'মানবিক নীতি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত একবারও প্রয়োজনের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ যথাক্রমে ৭৩%, ৬৯% এবং ৫৫%। ফলে খাতভিত্তিক মৌলিক চাহিদা পূরণে (বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশন, আশ্রয় ও সাইট ব্যবস্থাপনা) সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, ফলে অর্থ সহায়তা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পগুলোতে মানবিক ত্রাণ কর্মসূচি সংকুচিত হয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর বর্তাবে যা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ৪৪৩.৩০ মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮%। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২.৫ মিলিয়ন ডলার। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়সহ সামগ্রিকভাবে কোনো আর্থিক প্রাক্কলন এবং কৌশলগত কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ফলে রোহিঙ্গা সংকটের কারণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি তৈরিসহ দীর্ঘমেয়াদে সংকট মোকাবেলায় ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ

এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনায় এনজিও ব্যুরোর পক্ষ থেকে জবাবদিহি কাঠামো লক্ষণীয়। তবে অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে (কর্মসূচি বাস্তবায়নে) বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। অপরদিকে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি কাঠামো নেই। এছাড়া তাদের অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত (পরিচালন ব্যয়, কর্মসূচি ব্যয়) সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার এফডি-৭ এর আওতায় পরিচালিত কর্মসূচির ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জটিল ব্যবস্থা থাকলেও জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও তাদের অনুদানে পরিচালিত সংস্থাগুলোর বিতরণকৃত ত্রাণের কোনো যাচাই ব্যবস্থা নেই।

এফডি-৭ এর আওতায় যেকোনো প্রকল্প প্রস্তাবনায় মোট অনুদানের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করার নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণে ঘাটতির পাশাপাশি তা কিভাবে অনুসরণ করা হবে তার কোনো নির্দেশনা বা কাঠামো নেই। আবার ক্যাম্প পর্যায়ে চলমান কর্মসূচির তালিকা ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ক্যাম্প প্রশাসনকে অবহিত করার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা তা করে না। আরআরআরসি'র ওয়েবসাইটে ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওদের তালিকা, সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়া ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।

অপরদিকে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিও'র একাংশের পরিচালন ব্যয় তাদের কর্মসূচির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জাতিসংঘের সাতটি সংস্থার প্রদত্ত তথ্য (২০১৭-১৯) অনুযায়ী, সর্বোচ্চ পরিচালন ব্যয় ইউএন উইমেন (৩২.৬%) ও সর্বনিম্ন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (৩.০%)। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলোর প্রদত্ত কর্মসূচী ব্যয়ের মধ্যে তাদের অনুদানে পরিচালিত এনজিওসমূহের পরিচালন ব্যয়ও অন্তর্ভূক্ত। তাই প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচীর পরিচালন ব্যয়ের হারের সঠিক হিসাব শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক করা সম্ভব। তবে তা অবশ্যই নিম্নে প্রদত্ত হারের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি।

সারণি-১: রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় (২০১৭-২০১৯) জাতিসংঘের ৭টি অঙ্গসংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিচালন ব্যয় ও কর্মসূচি ব্যয়ের হার

জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থার নাম	পরিচালন ব্যয় (%)	কর্মসূচি ব্যয় (%)
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	২৫.৯৮	৭৪.০২
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)	১৪.৭	৮৫.৩
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)	১০.৩	৮৯.৭
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)	১৮.০	৮২.০
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)	৩.০	৯৭.০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭.০	৮৩.০
ইউএন উইমেন (UN WOMEN)	৩২.৬	৬৭.৫

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়, ৩০ অক্টোবর ২০১৯, ঢাকা

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে চ্যালেঞ্জ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ক্যাম্পে 'কমপ্লেইন্ট ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু থাকলেও অধিকাংশ রোহিঙ্গা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া সিআইসি অফিসে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা রূঢ় আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচারণার ঘাটতি ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংবেদনশীলতার ঘাটতির কারণে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির (মাঝি) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করে। অপরদিকে মানবিক সহায়তার কার্যক্রম ও কর্মসূচি সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা (যেমন, অভিযোগ বাক্স স্থাপন) লক্ষ করা যায়নি।

২.৪ মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

খাদ্য ও পুষ্টি

২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতে প্রয়োজন ছিলো যথাক্রমে ২৫৫ মিলিয়ন ও ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে যথাক্রমে ১৫৯ মিলিয়ন ও ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা প্রয়োজনের যথাক্রমে ৬২% ও ৩৫%।[৬] রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি, নতুন অনুপ্রবেশ, আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে খাদ্য সহায়তার ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়।

ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ বিতরণে চাহিদা নিরূপণে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। পরিবার পর্যায়ে নির্দিষ্ট ত্রাণ বিতরণে শুধুমাত্র মাথাপিছু সদস্য সংখ্যা বিবেচনা করা হয়। ফলে যেসব পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে প্রদত্ত ত্রাণ অপর্যাপ্ত হয়। এছাড়া নিয়মিত ত্রাণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া ও নিম্নমানের পণ্য সামগ্রী বিতরণের অভিযোগ রয়েছে। বিতরণকৃত চালের বস্তায় ৩০ কেজি লেখা থাকলেও অধিকাংশক্ষেত্রে ২৬-২৮ কেজি চাল দেওয়া হয়।

আবার খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় শুধুমাত্র চাল, তেল ও ডাল দেওয়া হয়। বর্তমানে খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে চালুকৃত ই-ভাউচারের আওতায় মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ২.৯% (২৬,৫৪২ জন) সহায়তা পাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গার খাদ্য বৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজ খরচে কিনে খেতে হয়। পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী (২০১৯), ক্যাম্পসমূহে ১৯.৩% শিশু অপুষ্টিতে ও ৫০% রক্তশূন্যতায় ভুগছে; এছাড়া ৬-২৩ মাস বয়সীদের মধ্যে ৭.৩% শিশু ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য পায়।

এলপিজি গ্যাস সরবরাহের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এখন পর্যন্ত ৪৬% পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গা পরিবার দৈনন্দিন জ্বালানি চাহিদার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ না করা লক্ষণীয়। অনেকক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলো দূরবর্তী হওয়ায় প্রবীন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ত্রাণ নিতে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এক্ষেত্রে অন্যের সহযোগিতা নেওয়ায় ত্রাণের একটি অংশ সাহায্যকারীকে দিতে হয়।

[৬] ISCG, *Rohingya Refugee Crisis: Joint Response Plan 2019 funding update*, 22 October, 2019, Cox's Bazar.

স্বাস্থ্য

২০১৯ সালে স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজন ছিলো ৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা চাহিদার তুলনায় মাত্র ৩৫ শতাংশ।[৭] রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সাতটি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু তা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও রোগীর চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। হাসপাতালগুলোতে সাধারণ শল্য চিকিৎসা এবং জরুরি প্রয়োজনে রক্ত সরবরাহে ব্লাড ব্যাংক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পগুলোতে ম্যালেরিয়া, টিবি, এইচআইভি, হেপাটাইটিস-বি জাতীয় রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির ঘাটতি রয়েছে।

ক্যাম্পগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গড়ে প্রায় ৮৫-৯০জন শিশু জন্মগ্রহণ করছে। ক্যাম্পগুলোতে নিবন্ধিত মোট এইচআইভি রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৬০০ জন। এইচআইভি আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশংকা থাকলেও এক্ষেত্রে কোনো স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। বাংলাদেশে ডিপথেরিয়া নির্মূল হওয়ার কাছাকাছি থাকলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এর মহামারির ঝুঁকি লক্ষণীয়। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ডিপথেরিয়ায় ৮,৬৪১ জন আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যু হয় ৪৫ জনের। ক্যাম্প পর্যায়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ওষুধের সবগুলো না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, এবং কিছুক্ষেত্রে যেকোনো অসুখের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে দালালের সহায়তা নিতে বাধ্য করা এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা

শিক্ষা সেবার জন্য ২০১৯ সালে প্রয়োজন ছিলো ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গিয়েছে যা প্রয়োজনের ৫০ শতাংশ।[৮] ক্যাম্পগুলোতে কোনো অনুমোদিত পাঠ্যক্রম না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান করে। এক্ষেত্রে লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক বা শিখন কাঠামো তৈরিতে বিলম্ব লক্ষণীয়। ক্যাম্পে প্রায় ১,১৭০০০ রোহিঙ্গা কিশোরের জন্য কোনো শিক্ষা পদ্ধতি না থাকায় ধীরে ধীরে তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রবণতাসহ অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার সামাজিক বাধানিষেধ ও চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে অধিকাংশ রোহিঙ্গা অভিভাবক তাদের কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ পোষণ করে। এছাড়া স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের কারণে তহবিল শেষ হয়ে গেলে অনেক লার্নিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

পানি ও স্যানিটেশন

পানি ও স্যানিটেশন খাত পরিচালনায় ২০১৯ সালে অর্থের প্রয়োজন ছিল ১৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা চাহিদার মাত্র ২২%।[৯] ক্যাম্পগুলোতে পানি সরবরাহে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ক্যাম্পের ভেতরে বিভিন্ন পয়েন্টে অগভীর নলকুপ ও হস্তচালিত পাম্প টিউবওয়েল নষ্ট। এছাড়া বেশিরভাগ ক্যাম্পেই নলকূপগুলো অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে ফলে খাবার পানি অনেকদূর হতে সংগ্রহ করতে হয়।

ক্যাম্পগুলোর একাংশের নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। কিছু ক্যাম্পে পর্যাপ্ত টয়লেট না থাকার কারণে অনেকক্ষেত্রে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস কর্তৃক টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা করা হয় না। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। ক্যাম্পগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপরিকল্পিত ও নাজুক হওয়ায় বর্ষাকালে ভারী বর্ষণে নালা ও নর্দমার পানি উপচে পড়ে। এর ফলে ক্যাম্পের রাস্তাঘাটে পানি জমে থাকে এবং হাঁটাচলায় সমস্যা হয়।

[৭] *প্রাগুক্ত*।
[৮] *প্রাগুক্ত*।
[৯] *প্রাগুক্ত*।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

২০১৯ সালে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদার পরিমাণ ছিল ৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে ৩৪ মিলিয়ন ডলার যা মোট চাহিদার ৩৯% ।[১০] এ খাত পরিচালনায় চাহিদা অনুযায়ী তহবিল না পাওয়ায় সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।[১১]

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দিনের বেলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও রাতের বেলা নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। ৩৪টি ক্যাম্পের মধ্যে দুইটি নিবন্ধিত ক্যাম্প ব্যতীত বাকিগুলোতে সিআইসি'র অধীনে নিরাপত্তা কর্মী নেই। নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে সিআইসি ও অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসি রাতের বেলা এসব ক্যাম্পে অবস্থান করেন না। ফলে দুইটি নিবন্ধিত ক্যাম্পের তুলনায় বাকিগুলোতে অপরাধ বেশি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যৌথ বাহিনী ক্যাম্পের ভেতরে শুধুমাত্র যেসব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো সেখানে টহল দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যৌথবাহিনী উখিয়ায় অবস্থিত ২৬টি ক্যাম্পে ৮টি দল এবং টেকনাফের ৮টি ক্যাম্পে ২টি দলে ভাগ হয়ে টহল দেয়।

মিয়ানমারে অবস্থানকালে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শিক্ষার সংকট এবং স্থানান্তরজনিত অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনোসামাজিক অসহায়ত্ব, সহিংস মনোভাব ও অপরাধ প্রবণতা তৈরি করেছে। ফলে ক্যাম্পগুলোতে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মাদকপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ বাড়ছে। কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের প্রেক্ষিতে মোট মামলা হয়েছে ৪৭১টি, এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ১,০৮৮ জন। এছাড়া ক্যাম্পগুলোতে পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির ঘটনা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে এতিম শিশু ও অল্পবয়সী মেয়েদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় সাতটি সন্ত্রাসী গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গ্রুপের হুমকির কারণে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা নারীদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ক্যাম্পভিত্তিক দালাল চক্রের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে দালালদের ১০-২০ হাজার টাকা এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর দেড়-দুই লক্ষ টাকা দিতে হয়। পাচারের ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ হিসেবে মহেশখালির সোনাদিয়া, জেটি ঘাট, নাজিরা টেক, কক্সবাজার পৌরসভার সোহলান্দি ঘাট, সদরের চৌফলন্দি ঘাট এবং টেকনাফের বাহারছড়া শিলখালি পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নারীদের পাচারের সংখ্যা বেশি।

অপরদিকে ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তাদের একাংশ স্থানীয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় জনগণের সাথে মূল স্রোতে মেশার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিজ ক্যাম্পের বাইরে চলাচল সীমিত করা হলেও ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় টমটম ড্রাইভারদের সহায়তায় ২৫০-৩০০ টাকার বিনিময়ে মরিচ্যা চেকপোস্ট এড়িয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করার অভিযোগ রয়েছে।

২.৫ অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি অংশীজন

এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনে (এফডি-৭) দীর্ঘসূত্রতা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন দাবির অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পেতে কমপক্ষে ৭-১৫ দিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাসেরও অধিক সময়ক্ষেপণের অভিযোগ পাওয়া যায়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র সংগ্রহে যথাক্রমে প্রকল্প প্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২০-৫০ হাজার টাকা ও ৫০-৭০ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসক ও ইউএনও কার্যালয়ের সংস্কার এবং একটি স্থানীয় অটিস্টিক বিদ্যালয়ে সহযোগিতার নামে সংস্থাগুলোকে টাকা দিতে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। আবার ক্যাম্পে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন/ছাড়পত্র পেতে সিআইসি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত টাকা ও অনৈতিক সুবিধা, যেমন বিমানের টিকিট, আত্মীয়-স্বজনের কেউ বেড়াতে আসলে গাড়ি ও হোটেল সুবিধা ইত্যাদি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ভাষ্য অনুযায়ী দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ সঠিক নয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রকল্প যাচাই বাছাইয়ে যৌক্তিক সময় নেওয়া হয়। এনজিওগুলো প্রকল্প দাখিলের পর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সঠিক প্রতীয়মান হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহাপরিচালক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ

[১০] *প্রাগুক্ত*।
[১১] *প্রাগুক্ত*।

হচ্ছে এনজিও কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প দাখিল, দাখিলকৃত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আইটেমের সাথে জেলা প্রশাসন ও আরআরআরসি কর্তৃক প্রেরিত তালিকার গরমিল, ইতোপূর্বে সম্পাদিত প্রকল্পে আরোপিত শর্ত মোতাবেক চাহিত প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট, প্রত্যয়ন পত্র, সমাপনী প্রতিবেদন, আরআরসি এবং ডিসি কক্সবাজারের নিকট দাখিলকৃত এফডি-৭ এর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র) ইত্যাদি দাখিল না করা এবং বাজেটে অসমাঞ্জস্যতা।

ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ভিন্ন ভিন্ন যাচাই ব্যবস্থার কারণে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ত্রাণের মালবাহী গাড়িপ্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২,৫০০-৩,০০০ টাকা আদায় করে এবং না দিলে ৫-১৫ দিন সময়ক্ষেপণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেসব সংস্থা ঘুষ দেয় তাদের ক্ষেত্রে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে শিথিলতার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য গৃহীত নমুনা ফেরত দেওয়া হয় না এবং প্রায়ই নমুনার সংখ্যা জোর করে বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে।

সিআইসিদের একাংশ এনজিওদের কার্যক্রম তদারকিতে বিশেষত কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে প্রতি কর্মসূচি বাবদ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২,০০০-৫,০০০ টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই টাকা দিতে কোনো সংস্থা অপারগ হলে পরবর্তীতে তাদের কাজে অসহযোগিতা করার অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি অংশীজন

ক্যাম্প পর্যায়ে এফডি-৭ এবং জাতিসংঘের অনুদানে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর একাংশের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন ঘর নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, লার্নিং সেন্টার স্থাপনসহ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) বাস্তবায়নে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ না করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাদের একাংশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত 'এনজিওগুলোর কর্মপরিধি' লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন: নিয়ম ভেঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে কাজের সুযোগ ও চাকরি দেয়া , মানবিক সহায়তার বাইরে প্রত্যাবাসনবিরোধী ভূমিকা রাখা, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি শার্ট বিতরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া, প্রকল্পে অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিতরণ, রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরনের অভিযোগ রয়েছে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি-শার্ট বিতরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দু'টি আন্তর্জাতিক এনজিও'র কার্যক্রম বন্ধ ও ব্যাংক হিসাব সাময়িক স্থগিত করেছে।

বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তিতে 'মাঝি'দের বিরুদ্ধে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ৫০০-১০০০ টাকা আদায় ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া 'মাঝি'দের দ্বারা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে যেকোনো বিচার-সালিশের মীমাংসার জন্য মাঝিদের টাকা ও ত্রাণের অংশ দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ টাকার পরিমাণ ২,০০০-৩,০০০ টাকা।

সারণি ২: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত ও পরিমাণ

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
এফডি-৭ অনুমোদন	সুনির্দিষ্ট নয়	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ
ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই	২,৫০০-৩,০০০ (গাড়ি প্রতি)	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কমিটির একাংশ
প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র	২০,০০০-৫০,০০০	ইউএনও অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	৫০,০০০-৭০,০০০	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	২০,০০০-২৫০০০ (ক্ষেত্রবিশেষে)	সিআইসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া	২৫০-৩০০	দালাল ও 'টমটম' ড্রাইভার পুলিশ চেকপোস্ট
মানব পাচার	১০,০০০-২০,০০০ (প্রাথমিক) ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ (পৌছানোর পর)	দালাল
বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তি	৫০০-১,০০০	মাঝি
ক্যাম্পভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি	২,০০০-৩,০০০	মাঝি

৩.১ প্রত্যাবাসনের চ্যালেঞ্জ

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিটার্ন অব ডিসপ্লেসড পার্সন্স ফ্রম রাখাইন স্টেট' ও ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ৩০ দফা 'ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর এবং ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

রোহিঙ্গা সংকট উৎপত্তির মূল কারণ মিয়ানমার সরকারের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক দায়-দায়িত্বও মিয়ানমার সরকারের ওপর বর্তায়। মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ অর্থাৎ প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের আস্থা সৃষ্টি হয়নি। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীজনের ভূমিকার ঘাটতি রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চীন, ভারত ও জাপানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি দেশ বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কিত কারণে এই তিনটি দেশই মিয়ানমারের পক্ষে ভূমিকা পালন করে, ফলে এ সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি কার্যত বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকা তৈরি ও যৌথ যাচাইয়ের কাজে বিলম্ব হওয়া লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় যৌথ যাচাইয়ের কাজ ২০১৮ সালের ২৪ জুন শুরু হলেও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৬০,৮৮৭ জনের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

৪.১ রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের ঝুঁকি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তা/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রভাব ও ঝুঁকি বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি

রোহিঙ্গা শ্রমিকদের সহজলভ্যতার ফলে স্থানীয়দের (উখিয়া ও টেকনাফ) কাজের সুযোগ কমেছে। অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয়রা বিভিন্ন কাজে (লবণ চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদ) রোহিঙ্গাদের নিয়োজিত করছে। ফলে স্থানীয় দিনমজুরদের মজুরি গড়ে ১৫ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে।[১২] এছাড়া স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন পণ্যের হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে শাকসব্জি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের দাম ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩] এছাড়া উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার সড়কগুলোতে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা, মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যানবাহন এবং ত্রাণবাহী ট্রাকের অতিরিক্ত চলাচল ও চাপে যানজটসহ রাস্তাঘাটের ক্ষতি হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী (২০১৯), এ এলাকায় যানজট ২.৫ গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৪]

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল (৩ নভেম্বর) পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ২,৩০৮.০২ কোটি টাকা।

সারণি ৩: রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	খাত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩.২০	কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণ
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২.৪৫	দু'টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪.৫৫	আইডি কার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১.৩২	এতিম শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯.৬৮	রাস্তা সংস্কার, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্যানিটেশন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২,২৬৫.৯১	আবাসন ও নিরাপত্তায় অবকাঠামো নির্মাণ
জননিরাপত্তা বিভাগ	.৯০৯৭	সেনা সদস্যদের দৈনিক ভাতা ও কন্টিনজেন্সি
মোট	**২,৩০৮.০২**	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ নভেম্বর ২০১৯।

[১২] Policy Research Institute (PRI), *Rohingya crisis and the host community*, 31 July 2019.

[১৩] *প্রাগুক্ত।*

[১৪] *প্রাগুক্ত।*

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের বড় অংশ জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসছে। ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের 'যৌথ সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৯২ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে অক্টোবর পর্যন্ত ৫০.৬ কোটি ডলার অনুদান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সংস্থাভিত্তিক অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে (২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত) জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থার (ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, আইওএম, ইউএনএফপিএ, এফএও, ইউএন ওমেন, ডব্লিউএইচও) তহবিল প্রায় ৪৪.৩ কোটি মার্কিন মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮ শতাংশ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গাদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ব্যয় করতে হয়নি। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আংশিকও যদি বহন করতে হয় তাহলে তা বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২৫ লক্ষ ডলার। উল্লেখ্য, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি (২০১৮) ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিন ৩০০ জন রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বছরভিত্তিক খরচের একটি প্রাক্কলন করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ২০২৫ সাল পর্যন্ত হলে ৪৪৩.৩ কোটি মিলিয়ন ডলার, ২০২৬ সাল পর্যন্ত হলে ৫৮৯.৮ কোটি ডলার এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হলে ১০৪৫.৬ কোটি ডলার ব্যয় হবে[১৫]। উল্লেখ্য এই ব্যয়ের মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সামাজিক ঝুঁকি

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মোট জনসংখ্যার ৩৪.৮% ছিল স্থানীয় অধিবাসী ও ৬৩.২% রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।[১৬] এছাড়া পূর্বে উখিয়া এবং টেকনাফে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ৭৯২ ও ৬৮০ জন, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩,৪৬৮ ও ২,০৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে।[১৭] ফলে এই দু'টি উপজেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক এগেইনেস্ট ফুড ক্রাইসিসের গ্লোবাল রিপোর্ট, ২০১৯ অনুযায়ী কক্সবাজারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এদের মধ্যে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা উভয়ই রয়েছে। আবার কক্সবাজার জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোকে তাদের মোট চাহিদার ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এছাড়া এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে স্থানীয়দের মধ্যে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা বিদ্যমান। রোহিঙ্গা সংকটের কারণে স্থানীয় প্রশাসনের ৫০ শতাংশ মানবসম্পদ ও লজিস্টিকস সহায়তা বর্তমানে রোহিঙ্গা সম্পর্কিত কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে কক্সবাজার জেলাসহ উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ঝুঁকি

দীর্ঘ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৯,১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আটক করার সংখ্যা ছিল ৬৯০ জন। পুলিশ, পাসপোর্ট অফিস ও নির্বাচন কমিশনের কিছু অসাধু কর্মচারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগসাজশে রোহিঙ্গাদের একাংশ জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরিসহ মোবাইল সিম কার্ড সংগ্রহ করছে। এছাড়া সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতির কারণে ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ রোহিঙ্গার হাতে মোবাইল ফোনের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইন ভিত্তিক ১০টি ইউটিউব চ্যানেলে রোহিঙ্গারা সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়াসহ নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে (টেকনাফ ও উখিয়া) সন্ত্রাসী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষণীয়। ক্যাম্পগুলোতে প্রায় সাতটির মতো সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মুক্তিপণ না পেলে হত্যা করে লাশ গুম করা, ইয়াবা ও মানবপাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আধিপত্য বিস্তার, মাদক ব্যবসা, জমি দখল এবং বিভিন্ন কোন্দলের কারণে রোহিঙ্গাদের একাংশ কর্তৃক স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট একজন রাজনৈতিক কর্মীকে নেতাকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে একদল রোহিঙ্গা উক্ত ব্যক্তিকে তার বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং পাশের একটি পাহাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার পর ২৪ আগস্ট বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা একটি রোহিঙ্গা শিবিরে হামলা চালিয়ে অস্থায়ী ঘরবাড়ি ও এনজিও অফিসগুলোতে ভাঙচুর করে এবং টেকনাফ পৌরসভা থেকে লেদা পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে।

---

[১৫] Implications of the Rohingya crisis, Centre for Policy Dialogue (CPD), 2018

[১৬] COAST and CCNF, *Crisis within the Crisis*, July 2018.

[১৭] *প্রাগুক্ত*।

পরিবেশগত ঝুঁকি

পরিবেশগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভূমিধস, বন উজাড়, খাবার পানির সংকট এবং বন্যপ্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্পে বসবাসরত পরিবারগুলোর দৈনন্দিন রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ৭৫০,০০০ কেজি কাঠ এবং বিভিন্ন গাছের শিকড় সংরক্ষিত বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনে (২০১৯) কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ক্যাম্প নির্মাণের ফলে প্রায় ৬,১৬৪ একর সংরক্ষিত বনভূমি, যার স্থানীয় হিসাবে মূল্য প্রায় ২,৪২০ কোটি টাকা, উজাড় হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ১,৪০৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া হাতির চলাচলের পথ নষ্ট হওয়াসহ বন্যপ্রাণীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন নিধনের এই ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজার জেলার পুরো বনাঞ্চল, হাতি এবং অন্যান্য জীবজন্তুদের আবাসস্থল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ মিলিয়ন ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে উখিয়া ও টেকনাফে পানির সংকট আরও প্রকট হয়েছে। উল্লেখ্য, টেকনাফ এলাকায় ৬০০ ফুট বা ১০০০ ফুট গভীরতার টিউবওয়েলগুলোতেও পানির সংকট তৈরি হয়েছে।

৫.১ উপসংহার

২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তঃযোগাযোগ এবং তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। জনবল ঘাটতির ফলে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। ক্যাম্পভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা মাঝি-কেন্দ্রিক হওয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজ-এর অনুপস্থিতি ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতির কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তায় অপ্রতুলতা তৈরি হচ্ছে। আবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও অগ্রগতির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকি ও অর্থনীতির ওপর চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ও তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকিসহ পরিবেশ ও বনায়ন বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে।

৫.২ সুপারিশ

সমন্বয় ও সক্ষমতা সংক্রান্ত

১. রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্পগুলোকে বিশেষ ও জরুরি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরুর অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আরআরআরসি'র মাধ্যমে করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিসি এবং ইউএনও অফিসকে কাজ শুরুর পূর্বে ও কাজ শেষ হওয়ার পর অবহিত করতে হবে।

২. ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে একীভূত যাচাই ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসি'র জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি সিআইসি'র আওতায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে; প্রতিটি ক্যাম্পে রাতের বেলা ক্যাম্প ইন চার্জদের (সিআইসি) অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সিআইসিদের মানবিক নীতিসমূহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাসহ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মানবিক সহায়তায় খাতভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে।

৭. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব নিরূপণ করে তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

৮. মানবিক সহাতায় প্রকল্প, অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত, বাস্তবায়নের স্থান ও অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তা হালনাগাদ করতে হবে।

৯. সিআইসি কর্তৃক ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে; কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

১০. মানবিক সহায়তায় কার্যক্রম ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি কার্যালয়ে কাঠামোবদ্ধ 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা' চালু করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. ক্যাম্প পর্যায়ে প্রতিটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত

১২. রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রত্যাবাসনসহ যেকোনো চুক্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।